গ্রামের পরীক্ষার্থীরা বেশী ফেল করে কেন?

ফাইজুস সালেহীন

১৯৯৮ সালের এইচএসসি পরীক্ষার রেজাল্ট প্রকাশিত হয়েছে অতিসম্প্রতি। যে ক'জন ধীমান ছেলেমেয়ে মেধা তালিকায় স্থান করে নিতে পেরেছে তাদের অনেকের আনন্দোজ্জ্বল ছবি ছাপা হয়েছে পত্রপত্রিকায়। সঙ্গে নাতিদীর্ঘ সাক্ষাৎকার এবং গর্বিত পিতামাতার ছবিও। সোনার টুকরো ছেলেমেয়েরা সাক্ষাৎকারে তাদের লেখাপড়া, শ্রম-সাধনা এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা বলেছে। এই মেধাবীদের বেশীরভাগই প্রচলিত ছাত্র রাজনীতির ঘোরবিরোধী। রাজনীতি সম্পর্কেও এদের খুব একটা আগ্রহ আছে বলে মনে হয় না। বিষয়টি তাৎপর্যপূর্ণ এবং লক্ষ্য করবার মত। এ নিয়ে অবশ্য আমরা আজকে আলোচনা করব না। বরং এই ফলাফলের মধ্য দিয়ে দেশের বিরাজমান শিক্ষা পরিস্থিতির যে চিত্রটি পাওয়া যায়, সে প্রসঙ্গে কিঞ্চিৎ আলোকপাত করবার চেষ্টা করব।

এবারকার এইচএসসিতে যারা ভাল ফল করেছে, তাদের অভিনন্দন জানাই। তাদের প্রতিভা এবং সাধনার সার্থকতাকে ছোট করে দেখার সামান্য অবকাশও নেই। কিন্তু, এরপরও কিছু কথা আছে, কিছু প্রশ্ন আছে। এইচএসসি'র ফলাফলের মধ্যে দেশের সামগ্রিক শিক্ষার যে চিত্রটি ফুটে উঠেছে তা কিন্তু মোটেও প্রীতিপ্রদ নয়। বরং এমন অনেক অসঙ্গতি ধরা পড়ে, যা চিন্তাশীলদের আহত না করে পারে না। এবছর এইচএসসিতে পাস করেছে সারা দেশে ৪৬ দশমিক ০৮ শতাংশ পরীক্ষার্থী। এর মানে হচ্ছে শতকরা ৫৩ দশমিক ৯২ ভাগ ছাত্রছাত্রী অকৃতকার্য হয়েছে। পাঁচ বোর্ডে সব মিলিয়ে পরীক্ষা দিয়েছিল চার লাখ ৭৯ হাজার ২৮ জন শিক্ষার্থী। এদের মধ্যে ফেল করেছে দুই লাখ ৫৮ হাজার দুইশ' ৮০ জন। আবার উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীদের মধ্যে অর্ধেকেরও বেশী পেয়েছে দ্বিতীয় বিভাগ কিংবা শুধু পাস। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, যারা ফেল করেছে এবং যারা দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় বিভাগে পাস করেছে এদের ভবিষ্যৎ কি? এদের সামাজিক অবস্থানই বা কি? এদের সবাইকে কি আমরা অমেধাবী বা কম মেধাসম্পন্নদের তালিকাভুক্ত করব?

প্রথমেই আসা যাক এসব ছেলেমেয়ের সামাজিক এবং প্রাতিষ্ঠানিক অবস্থান প্রসঙ্গে। এ প্রায় নিশ্চিত করেই বলা যায় যে, অকৃতকার্য এবং কোনও মতে পাস করাদের বেশীরভাগই গ্রামের ছেলেমেয়ে। আর আছে শহরাঞ্চলের সেইসব কলেজের ছাত্রছাত্রী, যেগুলোর বিশেষ কোনও নামডাক নেই। নামকরা কলেজেরও কিছু কিছু পরীক্ষার্থী ফেল বা তুলনামূলক খারাপ ফল করে থাকতে পারে। তবে তাদের সংখ্যা খুবই নগণ্য। ঢাকায় এবং দেশের অন্যান্য বড় শহরে কিছু কিছু নামকরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে, যেগুলো বরাবরই ভাল রেজাল্ট করে। প্রতিবছর ঘুরে ফিরে এসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরাই মেধা তালিকায় স্থান পায়। লেটার, স্টারসহ প্রথম বিভাগ এরাই পায় বেশী। পাসের হারও অধিক। এসব প্রতিষ্ঠান থেকে কদাচিৎ এক/দু'জন ফেল বা মন্দ ফল করে থাকে। আজকাল দু'চারটে লেটারসহ স্টার না পেলে অন্তত এসএসসি এবং এইচএসসিতে ভাল রেজাল্ট বলা হয় না।

এইচএসসি পরীক্ষা উত্তীর্ণ হওয়ার পর শিক্ষার্থীরা উপনীত হয় উচ্চ শিক্ষার দ্বারপ্রান্তে। মেডিক্যাল, ইঞ্জিনিয়ারিং বা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স কোর্স শুরু হয় উচ্চ মাধ্যমিকের পরেই। সাধারণ পাস এবং সেকেন্ড ডিভিশনওয়ালাদের তো কথাই নেই, সাদামাটা ফার্স্ট ডিভিশন যারা পেয়েছে, তারাও অনেক ক্ষেত্রে ভর্তি পরীক্ষায় অ্যাপিয়ার হওয়ার সুযোগ পাবে কিনা সন্দেহ। চান্স পাওয়া তো পরের কথা। এমতাবস্থায় এদের ভবিষ্যৎ কি? শহর বা গ্রামের নামগোত্রহীন কলেজে ডিগ্রি ক্লাসের খাতায় নাম লিখিয়ে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে যাত্রা করাই এদের ভবিতব্য। পাশাপাশি এদের অনেকে হয়ত পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেখে দেখে দরখাস্তের পর দরখাস্ত করে যাবে ছোটখাটো কোনও একটা চাকরির আশায়। একের পর এক ইন্টারভিউ দিয়ে যাবে। চাকরি হবে দু'একজনের। বেশীরভাগের কাছেই চাকরি থেকে যাবে সোনার হরিণ হয়ে। তাকে না যায় ধরা, না যায় ছোঁয়া। এভাবে তাদের বয়স বাড়বে। কেউ কেউ এরই মধ্য দিয়ে বিএ অথবা মফস্বলের কোন কলেজ থেকে হয়ত অনার্সসহ এমএও পাস করে যাবে। রেজাল্ট আরও খারাপ হবে। চাকরি পাওয়া যাবে না। একদিন হয়ত চাকরির বয়সও ফুরিয়ে যাবে। তখন তাদের নাম উঠে যাবে কনফার্ম বেকারের তালিকায়। অবশ্য, এদের মধ্যেও যে কেউ কেউ জীবনে ভাল রকম দাঁড়িয়ে যাবে না, বড় ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, চাকরি দেনেওয়ালা কোটিপতি, রাজনীতিবিদ, লেখক-সাংবাদিক, নিদেনপক্ষে উকিল বনে যাবে না- এমন কথা কেউ নিশ্চয় করে বলতে পারে না। কিন্তু, সে সবই হবে ব্যতিক্রম।

অতীতে কিন্তু অবস্থাটি এরকম ছিল না। লেটার ও স্টারের এত ছড়াছড়ি ছিল না। ম্যাট্রিক এবং ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হলে তো কথাই নেই, সেকেন্ড ডিভিশন পেলেও খুব একটা দুশ্চিন্তার কারণ ঘটত না। দ্বিতীয় বিভাগে পাস করেও উচ্চতর শ্রেণীতে ভর্তি হতে অসুবিধা হত না। এমনকি রেফার্ড বা কম্পার্টমেন্টাল পেয়েও (এক বিষয়ে ফেল করে তিন মাস পর পুনরায় এই বিষয়ে পরীক্ষা দিয়ে পাস করা) উচ্চ শিক্ষার সুযোগ নেয়া যেত। এখন দিন বদলেছে। এখন চাই স্টার-লেটার, নিদেনপক্ষে ফার্স্ট ডিভিশন। তা না হলে না আছে চাকরি, না আছে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ। এই পরিস্থিতিতে যে বিপুলসংখ্যক ছেলেমেয়ে এইচএসসিতে প্রথম বিভাগ পায়নি, তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত না হয়ে পারা যায় না।

গ্রামের স্কুলের কিংবা কলেজের কোনও ছেলে বা মেয়ে একালে খুব ভাল রেজাল্ট করবে- এমনটি যেন চিন্তাই করা যায় না। অথচ নিস্তরঙ্গ গ্রামজীবনে অনেক পরিবর্তন এসেছে। প্রত্যন্ত পল্লীর ঘরে বিদ্যুতের বাতি জ্বলে। ফ্যাক্স-ফোন, মোবাইল ও স্যাটেলাইট কালচার পৌঁছে গেছে গ্রাম-মফস্বলে।

কেবল এবারের এইচএসসি বলে কথা নয়, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এরকমই রেজাল্ট হতে দেখা যাচ্ছে এসএসসিতেও। মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় ফি বছর লাখ লাখ ছেলেমেয়ে ফেল করছে অথবা বর্তমানের হিসাবে খারাপ রেজাল্ট করছে। পা বাড়াচ্ছে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের পথে। কিন্তু কেন? এ জন্য কি কেবল সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীরাই দায়ী? নাকি দায়ী আমাদের সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা? আমরা আগেই বলেছি যে, গ্রামের এবং শহরের নামডাকবিহীন স্কুল ও কলেজের শিক্ষার্থীরাই অধিক হারে ফেল করে থাকে। তুলনামূলক মন্দ ফলও জোটে এদেরই ভাগ্যে। এর কি কারণ? এহেন জিজ্ঞাসার চটজলদি জবাব এই যে, ওই শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা গরীব, এদের অনেকের বাড়িতে পড়াশোনার পরিবেশ নেই, অভিভাবকরা বেখেয়াল ও সামর্থ্যহীন। কেউ কেউ হয়ত আরেকটু বেড়ে এমনও বলতে চাইবেন যে, গ্রামের ছেলেমেয়েরা মেধার দিক দিয়েও হীনবল। কাজেই ওদের পক্ষে ভাল ফলাফল করা নিতান্তই কঠিন। এসব কথায় সত্য এবং যুক্তি যে কিছুমাত্র নেই, তা নয়। কিন্তু এগুলো এমন কোনও সমস্যা নয়, যার কোনও প্রতিকার নেই। এই সমস্যাগুলো আগের দিনে কিন্তু আরও বেশী ছিল। কিন্তু অতীতে গ্রামের স্কুলের ছেলেরাও ভাল রেজাল্ট করত। মেধা তালিকাতেও তাদের নাম পাওয়া যেত। এখনকার মত শহরের তথাকথিত ভাল স্কুল-কলেজের একচেটিয়া অধিকার ছিল না ভাল রেজাল্টের ক্ষেত্রে। দেশে অনেক মেধাবী আমলা ও অধ্যাপক আছেন যারা গ্রামের স্কুলে পড়েছেন। কিন্তু এখন এমনটি চিন্তা করতেও সঙ্কোচ লাগে।

গ্রামের স্কুলের কিংবা কলেজের কোনও ছেলে বা মেয়ে একালে খুব ভাল রেজাল্ট করবে- এমনটি যেন চিন্তাই করা যায় না। অথচ নিস্তরঙ্গ গ্রামজীবনে অনেক পরিবর্তন এসেছে। প্রত্যন্ত পল্লীর ঘরে বিদ্যুতের বাতি জ্বলে। ফ্যাক্স-ফোন, মোবাইল ও স্যাটেলাইট কালচার পৌঁছে গেছে গ্রাম-মফস্বলে। থানা সদরে এবং প্রত্যন্ত গ্রামেও অনেক ছেলেমেয়ে গ্রামেই লেখাপড়া করে। অন্যদিকে শিক্ষাখাতে সরকারী ব্যয়-বরাদ্দ এখন পূর্বের তুলনায় অনেক বেশী। লেখাপড়ায় গ্রামের মেয়েদের উৎসাহিত করার জন্য উপবৃত্তির ব্যবস্থা আছে। বেসরকারী স্কুল ও কলেজের শিক্ষকদের অর্থনৈতিক অবস্থাও পূর্বের তুলনায় অনেক ভাল। পাকিস্তান আমলে গ্রামাঞ্চলের স্কুলের টিচাররা মাস মাস ঠিকমত বেতনও পেতেন না। গ্রামের শিক্ষার্থীর অভিভাবকরা ঠিকমত মাসমাহিনা পরিশোধ করতে পারতেন না। সরকারী অনুদানও তেমন ছিল না। কিন্তু এখন বেসরকারী স্কুল ও কলেজের শিক্ষকদের বেতনের ৮০ শতাংশ সরকারী কোষাগার থেকে পরিশোধ করা হয়। মেয়েদের শিক্ষা ফ্রি। ওদের বেতনটা স্কুল কর্তৃপক্ষকে সরকার দিয়ে দেয়। তদুপরি শিক্ষকদের দফতর উন্নয়নের জন্য বিবিধ প্রশিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। শহরাঞ্চলের বেসরকারী স্কুল-কলেজগুলোর ক্ষেত্রেও একই কথা। এরপরও লেখাপড়ার মান নেমে যাচ্ছে কেন? গ্রামের এবং শহরের সাধারণ স্কুল কলেজের শিক্ষার্থীরা গণ্ডায় গণ্ডায় ফেল করবে কেন? এ জন্য কি ওই সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের কোনও দায় নেই? কোনও দায়িত্ব কি নেই শিক্ষা বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের? আসলে ওই সমস্ত স্কুল ও কলেজের শিক্ষকরা এবং পরিচালনা কমিটি লেখাপড়ার মানোন্নয়নের ব্যাপারে কোনও চিন্তাই করেন না। তারা বরং ধরেই নিয়েছেন যে, তাদের প্রতিষ্ঠানে যারা পড়তে আসে, তারা ভাল রেজাল্ট করবার উপযুক্ত নয়। কোনও মতে পাস করা অথবা ফেল করাই এদের ললাট লিখন। কাজেই শিক্ষকদের গা ছাড়া ভাব। লেখাপড়া কেমন চলছে, ছেলেমেয়েদের পরীক্ষার প্রস্তুতি কেমন হচ্ছে, তা নিয়ে তারা মোটেও ভাবিত নয়।

নির্বাচনী পরীক্ষায় পাস না করলেও দ্বিগুণ তিনগুণ টাকা নিয়ে ওই সমস্ত স্কুল-কলেজের কর্তৃপক্ষ ফরম ফিলাপ করার সুযোগ করে দেয়। তাদের চাই টাকা। পাস-ফেল কোনও ব্যাপার নয়। নির্বাচনী পরীক্ষার পর আবার তিন মাস ক্লাস বন্ধ। কোচিং-এর কোনও বালাই নেই, যদিও ফরম ফিলাপের সময় শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে প্রায়শই কোচিং ফি বাবদ মোটা অংকের টাকা আদায় করা হয়। এসব পরীক্ষার্থী ছেলেমেয়ের অভিভাবকদের অধিকাংশেরই এমন সামর্থ্য নেই যে, ফরম ফিলাপের সময় একবার এক কাড়ি টাকা দেবার পর ফের প্রাইভেট পড়াবেন। এমতাবস্থায় নির্বাচনী পরীক্ষার পর দু'তিন মাস এই শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা বস্তুতপক্ষে নিরালম্ব হয়ে থাকে। স্কুল-কলেজে ক্লাস নেই, প্রাইভেট টিউটরও নেই। মাঝখানের এই তিন মাসে অনেক পরীক্ষার্থী আগের শেখা পাঠও ভুলে যায়। এরা পরীক্ষার হলে উপস্থিত হয় অপ্রস্তুত অবস্থায়। পরিণামে ফেল অথবা টেনেটুনে পাস।

এই অবস্থার পরিবর্তন হওয়া দরকার। এ ব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং অধিদফতরের দৃষ্টি দেয়া একান্ত আবশ্যক। জেলা এবং থানা পর্যায়ে শিক্ষা অফিসার আছেন। এদের সময় সময় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের নিয়ম থাকলেও কার্যক্ষেত্রে ব্যাপারটি ঘটতে তেমন দেখা যায় না। কর্মকর্তারা যাও মাঝেমধ্যে পরিদর্শনে যান; অভিযোগ রয়েছে যে তাও লেখাপড়ার হদিস নেয়ার জন্য নয় বরং টুপাইস কামাবার জন্য। দুর্নীতি এবং দায়িত্বহীনতা তথা কর্তব্য কাজে অবহেলা সমানেই চলছে। আর এর বিরূপ প্রতিক্রিয়ার অসহায় শিকারে পরিণত হচ্ছে সাধারণ মানুষের শিক্ষার্থী সন্তানেরা। বিপর্যস্ত হচ্ছে তাদের ভবিষ্যৎ।